ভূতের বাঁশি

পাঞ্জো এখন লরি চালায়। কলকাতা, বারাকপুর, কল্যাণী কিংবা রায়গঞ্জ, বহরমপুর, শিলিগুড়ি হলেও তবু কথা ছিল, পাঞ্জো মাল বোঝাই লরি নিয়ে যায় বম্বে, বাঙ্গালোর, দিল্লি, অমৃতসর, জম্মু, শ্রীনগর, লেহ্, কালিকট, ত্রিবান্দ্রম, কন্যাকুমারী— আরও কাঁহা কাঁহা। মোটকথা, দূরের রাস্তা নেই তো পাঞ্জোও নেই। যত দূরের রাস্তা হবে, যত জঙ্গলের মধ্যে হবে, যত নির্জন হবে ততই নাকি সে পরীর দল দেখতে পায়, ঠাকুরদেবতাদের দেখে, একবার নাকি ঝাঁক ঝাঁক প্রজাপতিদের ভূত দেখেছিল, ভারি মিষ্টি চেহারা।

পাঞ্জো প্রথমে চালাত নৌকো। হাতানিয়া-দোয়ানিয়া, সপ্তমুখ, ঠাকুরান, ওদিকে মাতলা বিদ্যাধারী— এদিককার সব নদীই তার মুখস্থ। মাঘের শীতে, চৈত্রের ঝড়ে, শ্রাবণের বৃষ্টিতে সে কত দিন তার নৌকোয় যাত্রী নিয়ে সুন্দরবনের কোথায় না কোথায় পৌঁছে দিয়েছে!

নদীতে নদীতে ঘুরতে ঘুরতেই সে মাধ্যমিক পাশ করে গেল। পাঞ্জো বলে সে তারার আলোয় খবরের কাগজের হেডিং আর পুন্নিমের চাঁদের আলোয় স্কুলের বই পড়তে পারে। আর গান গাইবার পক্ষে নদীর হাওয়ার মতো ভালো মাইক নাকি আর হয় না। তবে নদীতে সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার, আকাশের প্রাণীরা ঝাঁক ঝাঁক তারার চেহারা ধরে দলে দলে জলে নেমে পড়ে। আকাশ থেকে ডাঙার চেয়ে জলে নামাই তো বেশি সুবিধে।

সেকেন্ডারি দিয়ে কলকাতায় তার মাসির ঝুপড়িতে থেকে সে কিছুদিন টাইপিং শেখার চেষ্টা করে শেষপর্যন্ত ড্রাইভারি শিখল। গ্রামে তার মা বাপ ভাই বোন তার মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে, তাদের দুবেলা চাল জোটে না, যে করেই হোক চাকরি তার একটা চাই-ই।

প্রথমে জুটল হপ্তায় দুদিন গাড়ি চালানোর কাজ। কাদের যেন ঠাকুমা প্রত্যেক শনি-মঙ্গলবার গাড়ি চড়ে বাগবাজার যায়, গঙ্গায় চান করতে।

এরপর সে কিছুদিন এখানে ওখানে কখনও ডাক্তার, কখনও উকিল, কখনও জ্যোতিষীর গাড়ি চালাল। একবার একটা কনস্টেবলের ট্যাক্সিও সে চালায়। শেষমেশ পাঞ্জো স্টেটসম্যান কাগজের এক সাহেবের গাড়ির ড্রাইভার হয়ে গেল।

এই চাকরিটায় মাইনেও ভালো, আর সকলের কাছে বেশ খাতিরও মেলে। সুন্দরবনে তার বাড়িতে পাঞ্জো এখন আশ মিটিয়ে টাকা দিতে পারে। মাসের প্রথম রবিবার সে নিজে গিয়ে টাকা দিয়ে আসে। মা বাবা ভাই বোনেদের জন্য কলকাতা থেকে কত রকম জিনিস যে কিনে নিয়ে যায় তার মা বাবা পর্যন্ত তার অনেকগুলোর

নাম জানে না, দেখেইনি কখনও।

এমন ভালো চাকরিটা হঠাৎই চলে গেল। তার দোষের মধ্যে সে তার সাহেবকে দমদমে ভোররাতে বিলেতের প্লেন ধরাতে পারেনি। পারবে কী করে? সে তো গাড়ি চালাতেই পারছিল না। মাঘ মাস, কুয়াশায় দুহাত দূরের রাস্তাও দেখা যায় না, তার ওপর আকাশ থেকে কুয়াশায় মিশে দলে দলে নেমে আসছে বাচ্চা বাচ্চা সব পরী। ফগ লাইট জ্বেলে, সার্চ লাইট জ্বালিয়ে, বারবার হর্ন দিয়েও এগোয় কার সাধ্যি! শুধু কুয়াশা হলে পাঞ্জো ফগ লাইট জ্বেলে কুয়াশা ফুঁড়ে ঠিক গাড়ি বের করে নিয়ে যেত। কিন্তু পরীদের ভিড় ঠেলে সে গাড়ি চালাবে কী করে? একেবারে বাচ্চা বাচ্চা সব পরী!

সাহেব ঠাস করে তার গালে এক চড় কষিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, আর সব গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে, তোর গাড়িই শুধু পরীতে আটকে রেখেছে, বাঁদর?

তারপর থেকে পাঞ্জো দূরপাল্লার লরির ড্রাইভার। সে প্রতিজ্ঞা করেছে এ জীবনে আর কখনও কোনও সাহেবের গাড়ি চালাবে না। কত জঙ্গলের পথ সে পেরিয়ে যায়, কত পাহাড়ের গা ঘেঁসে কত দূরের রাস্তায় সে লরি চালায়, শুকিয়ে যাওয়া নদীর ওপর দিয়ে দুলতে দুলতে তার লরি নদীর ওপারে চলে যায়, কত তারা ভরা আকাশের নীচে একদম জনহীন রাস্তায় সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লরি চালায়, চালাতে চালাতে সে কখনও গলা ছেড়ে, কখনও শিস দিয়ে গান গায়।

পাঞ্জো আজকাল কত কী যে দেখতে পায় সব কি আর বলে শেষ করা যায়? তার দুঃখ, সে যেসব আশ্চর্য জিনিস দেখে, অন্যরা সেসব দেখতে পায় না।

তার লরির হেল্পার ইল্লে-বিল্লে বলে দুটো কমবয়সি ছেলে। তারা বলে, পাঞ্জো ডেরাইভার পুরো মানুষ না, আদ্ধেকটা ভূত, আর আদ্ধেকটা দেব্‌তা, আদ্ধেক পরী-হুরি, আদ্ধেকটা মানুষ।

আমাকে বলতেই হয়, একটা মানুষকে অতগুলো আদ্ধেক করবি কী করে রে পাগলা?

শুনে ইল্লে নিজের ন্যাড়া মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, কী জানি বাবু, কিন্তু কথাটা একদম সত্যি, আমরা নিজের চোখে দেখেছি, বিশ্বেস না হয়, বিল্লেকে জিজ্ঞেস করুন।

বিল্লেরও একই রকম ন্যাড়া মাথা, কচি কদমফুলের মতো, সারা বছর এই রকমই থাকে। আমি কিছু বলবার আগেই সে-ও ইল্লের মতো মাথায় হাত বোলাতে লাগল।

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পাঞ্জোর মুখস্থ। ভারতের সব বড় বড় রাস্তাই তার নিজের হাতের তালুর মতো চেনা। কিন্তু জোছনা রাতে, আকাশ কালো করা বৃষ্টির দুপুরে, শীতের কুয়াশায়, কিংবা তুসতুস করে বরফ পড়বার সময় সেইসব রাস্তা দিয়ে লরি চালাতে চালাতে হঠাৎ হঠাৎ এমন সব দৃশ্য পাঞ্জো দেখতে পায় যে তখন এতদিনের চেনা রাস্তাও আর চেনা থাকে না, মনে হয় যেন কোনও এক অচেনা দেশে চলে এসেছে! একদিন হিমাচল প্রদেশের পাহাড়ি রাস্তায় লরি চালাতে চালাতে কিন্নর-কৈলাস পাহাড়চুড়োয় সে নাকি স্পষ্ট দেখেছে মহিষাসুরের সঙ্গে দুর্গা ঠাকুরের সাংঘাতিক যুদ্ধ হচ্ছে। তখন সূর্য অস্ত যেতে গিয়ে থমকে গেছে, মহিষাসুরের রক্ত

ছিটকে এসে লেগেছে মেঘের গায়ে, মেঘের সেই রক্তমাখা চেহারা কেউ নাকি কল্পনাও করতে পারবে না।

পাঞ্জো কথা বলে হড়বড় করে, ফাঁকা রাস্তায় লরি ছোটাবার মতো। আমি তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হিমাচলের ওরকম দুর্গম জায়গায় তুই লরি নিয়ে গিয়েছিলি কেন?

—বা! একবার নাকি, কত বার আমাকে যেতে হয়— আপেল আনতে হয় না?

তা-ও বটে।

পাঞ্জোকে আমি প্রথম দেখি সুন্দরবনে বিদ্যাধরী নদীর তীরে, এক পূর্ণিমা রাতে। সুন্দরবনের গোসাবা থেকে বিজয়নগর গ্রামে আসছিলাম, রাত তখন অনেক।

রাত হলেও নৌকো নিয়ে কোনও অসুবিধা নেই, কেননা নৌকোর মাঝির বাড়িও বিজয়নগরে।

বিজয়নগরে যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় বারোটা বাজে। ভাঁটার সময়। নদীর ডাঙা থেকে জল অনেক দূর সরে গেছে। জল থেকে ডাঙা পর্যন্ত দইয়ের মতো কাদা। অতটা কাদা পেরিয়ে আমাদের ডাঙায় পৌঁছতে হবে।

আমি নৌকো থেকে নেমে আর সকলের নামার জন্য অপেক্ষা করছি। ডাঙায় পা দিয়েই আছাড় খেলেন নবনীতাদি। নবনীতা দেবসেন। অত বড় পণ্ডিত ও কবি, তার ওপর সব সময় দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাঁকে ওইভাবে কাদার ওপর আছাড় খেয়ে পড়তে দেখে আমি হাসতে হাসতে একবারে লুটিয়ে পড়ি আর কী! প্রাণপণে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছি, হঠাৎ দেখি নবনীতাদির বড় মেয়ে পিকোলো কাদায় পা দিয়েই এক আছাড়! তারপর ছোট মেয়ে টুম্পার একই অবস্থা। মাঝি ছাড়া আমাদের দলে আর ছিল নবনীতাদির ভাই দীপঙ্কর আর আমার সুন্দরবনের বন্ধু অতনু, এরাও দুজনে পর পর ধপাস ধাঁই।

আমি ছাড়া সকলেরই পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাদামাখা, সকলেই খুব হাসছি, তারই মধ্যে সবাই পা টিপে টিপে সাবধানে ডাঙার দিকে এগিয়ে চলেছি, হঠাৎ কিসে হোঁচট খেয়ে আমিও কাদায় পড়লাম। হোঁচট লাগল কিসে? দেখি ছোট একটা ছেলে কাদার মধ্যে ঘুমোচ্ছে, তাতেই পা আটকে আমি পড়ে গেছি। ছেলেটা ততক্ষণে উঠে বসেছে। যে মাঝির নৌকোয় আমরা এলাম, জানা গেল এ সেই মাঝিরই ছেলে। বাবার দেরি দেখে নদীতে এসে অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

মাঝি বলল, এ ছেলে মহা বদমাশ। এর নাম কি রেখেছি জানেন বাবু? পাঞ্জো।

পাজি আর শয়তান মিলে নাকি পাঞ্জোই হয়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এভাবে কাদায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিলি কেন?

পাঞ্জো ফটফটে জ্যোৎস্নায় আমার চোখে চোখ রেখে বলল, ঘুমোচ্ছিলাম না তো, আমাকে একটা কুমিরের ভূত কাদায় শুইয়ে রেখেছিল। যাতে উঠে পালাতে না পারি সেজন্য তার লম্বা লেজটা আমার বুকের ওপরে ফেলে রেখেছিল। বাপরে কী ভারি! ঘুমোব কী, আমার দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল!

হঠাৎ আমার একেবারে কাছে এসে গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, চারদিন আগে একাদশীর দিন মরেছে, তার আগে পর্যন্ত এখানে রোজই দুপুরে রোদ পোয়াত,

শুক্লপক্ষে রাতে জোছনা পোয়াত, আমি একে কতদিন নদী থেকে মাছ ধরে খেতে দিয়েছি— এ ছিল এ তল্লাটের কুমিরদের রাজা।

আমরা সেবার সুন্দরবনে গিয়েছিলাম সেখানকার জেলে-মউলিদের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনতে। মউলি কাদের বলে জানো? যারা বন থেকে চাক ভেঙে মধু আনে।

এ ঘটনা অনেক দিন আগের। পিকোলো-টুম্পার বাবা তখন গরিবদের কিসে ভালো হয় তা নিয়ে মোটা মোটা বই লিখছেন, সেইসব বইয়ের জন্যই সাহেবরা তাঁকে গত বছর নোবেল প্রাইজ দিল।

এক রবিবার পাঞ্জো এল আমি তার সঙ্গে মানসসরোবরে যাব কি না জানতে। কলকাতা থেকে নেপালের কাঁকরভিটা দিয়ে কাঠমান্ডু হয়ে সে জিপে তিব্বতের মানসসরোবর যাবে। অনেক দিন থেকেই তার নাকি কৈলাস-মানস যাবার খুব ইচ্ছে। সেইজন্যই সে আজকাল লরির বদলে জিপ চালায়।

পাঞ্জোর মুখ ভারি শুকনো দেখাচ্ছে, হয়তো সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। আমি তাকে জোর করে যা হোক কিছু খাইয়ে দিলাম।

খাওয়া শেষ করে পাঞ্জো খানিকক্ষণ কী ভাবল, তারপর বলল, অনেক দিন বিন্ধ্যাচল পাহাড়ে যাওয়া হয়নি। একবার বিন্ধ্যাচল পাহাড়ের মাথায়, সন্ধ্যাতারার ঠিক নীচে, দেখলাম কর্ণ আর অর্জুন দুজনে বাঁশি বাজাচ্ছে, বাঁশিটা বড় একটা গুলতির মতো, অথচ সেটা তলতা বাঁশের, তার একটা মুখে ফুঁ দিচ্ছে কর্ণ, আরেকটা মুখে অর্জুন, আর বাঁশিতে যে ফুটোগুলো থাকে, যে ফুটো আঙুল দিয়ে ঢেকে আর খুলে সুর তোলা হয়, গুলতির দণ্ডটার ওপর সেইসব ফুটোর কয়েকটাতে কর্ণ আর কয়েকটায় অর্জুন আঙুল খেলাচ্ছে। একটাই বাঁশি এরকম একসঙ্গে দুজনকে বাজাতে আমি কোথাও দেখিনি।

আমি হাসি চেপে বললাম, কর্ণ অর্জুন— তুই চিনলি কী করে? তাছাড়া ওরা তো কবেই মরে ভূত হয়ে গেছে। ভূত কি বাঁশি বাজায়?

পাঞ্জো উত্তর না দিয়ে খুব অবাক হয়ে আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, সুরটা এত সুন্দর, এখনও আমার কানে লেগে আছে। অনেকটা এইরকম—শুনুন—

বলে সে দুচোখ বুজে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে শিস দিতে লাগল।

প্রকাশ: এপ্রিল ২০০২